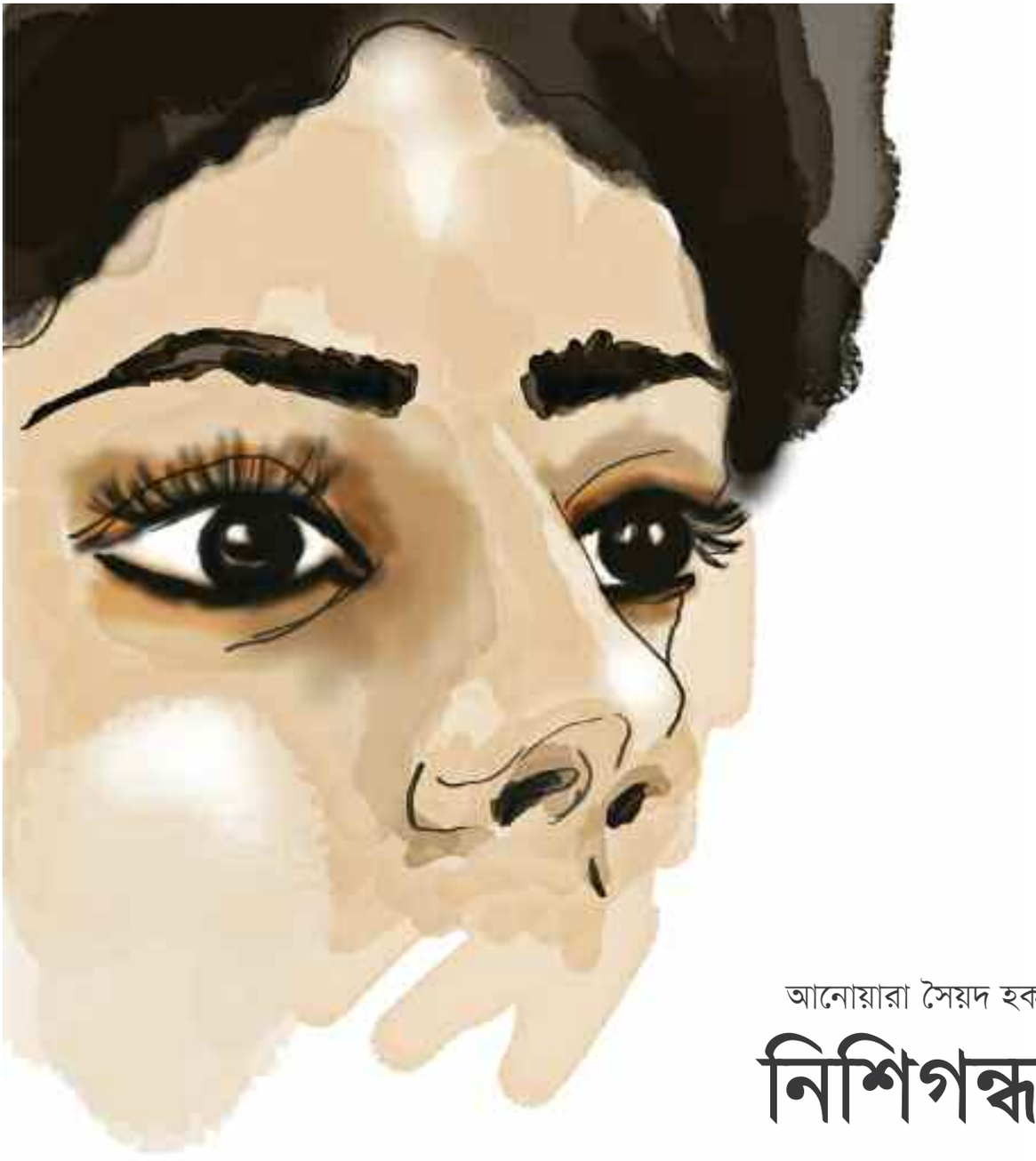

আনোয়ারা সৈয়দ হক

নিশিগন্ধা

গল্প

গহিন এই অরণ্যে কেউ প্রবেশ করতে সাহস পায় না, শুধু মেজবাহ ছাড়া। তার সাহস বনে বাদারে অক্ষত দেহে ঘুরে বেড়াবার জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছে সেই বহুদিন। অরণ্য না বলে জঙ্গল বলাই উচিত। এই এলাকায় এরকম জঙ্গল আর নেই বললেই চলে। জঙ্গলের মালিকানা মেজবাহর বাপ-দাদার। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকহানাদার বাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে এই জঙ্গলটা খুব কাজে দিয়েছিল। একবার সে গ্রামবাসীর সঙ্গে এক নাগাড়ে সাতদিন এই জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে ছিল। গাব গাছের বুনো গাব পেড়ে খেয়ে তার খিদে মিটিয়েছিল। তখন দিনরাতের হিসাব ছিল না। থাকার কথাও নয়। সাক্ষাৎ মৃত্যু তখন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় তার গ্রামের কত মানুষ যে মারা গিয়েছিল, কত মানুষকে যে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে ছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, তার কোনো হিসাব এখন পর্যন্ত কেউ করার সুযোগ পায়নি। তারপর তো দেশ স্বাধীন হলো। প্রাণভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে থাকার আর কোনো যৌক্তিকতা থাকল না। কিন্তু মেজবাহর যা হবার তা হয়ে গেল! কিন্তু কী যে হলো, ঠিক কী যে, তা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু প্রতিদিন অন্তত একবার হলেও তার জঙ্গলে ঢোকা চাই।

এখন মেজবার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছে। ঝাঁকড়া মাথায় একটা দুটো কাঁচা পাকা চুল। শরীরের কালোর ভেতরে জেল্লা আর আগের মতো নেই। কিন্তু বাঁধন এখনও অটুট। এই জীবন নিয়ে মেজবাহ মোটামুটি খুশি। কারণ তার কোনো অভাব নেই। বাবা তার স্বাধীনতার পরপরই মারা গেছে। যদিও তার তখন মরার বয়স ছিল না। কিন্তু ঐ যে মুক্তিযুদ্ধের সময় গঞ্জের বাজারে এক মিলিটারির বুটের লাথি তার বুকে পড়েছিল, তারপর থেকে সে আর ভালো হলো না। এক বছর ধরে বুকে ব্যথা নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে গেল বাবা।

মরে যাবার আগে এক রাত্তিরে মেজবাহকে কাছে ডেকে নিয়ে বলল, সাবধানে থাকিস, বাজান। তোর মারে দেইখে রাখিস। যেদিন মিলিটারির লাথি আমার বুকের উপর পড়িলো, সেদিনই জানি আমার হয়ে গিয়েছে! কিন্তু তবু আল্লারে হাজার শোকর যে স্বাধীন দেশ চোখে দেইখে যাতি

পারলাম। আর জমি যাতি যা রেইখে গ্যালাম, ঠিক মতন বুঝে সুঝে চললি পরে তোর আর ভাতের অভাব হবে না নে।
তো বাপের কথাই ঠিক। ভাতের অভাব মেজবাহ আলির কোনোদিন হয়নি। কোনো কিছুরই অভাব হয়নি। শুধু তার নিজের সংসারটা হয়নি এখন পর্যন্ত। এবং এ ব্যাপারে মেজবাহর যেন আগ্রহও নেই।
বাড়ির পাশের ফুপাতো বোনটা তার জন্যে ছেলেবেলা থেকে অপেক্ষা করে থাকতে থাকতে তার বিয়ে হয়ে চলে গেছে অন্য এক সংসারে। ঠিক আপন ফুপাতো বোন নয়, তার বাবার চাচাতো বোনের মেয়ে। তবে ফুপাতো বোনকে বিয়ে করে সংসারে তুলতে মেজবাহর নিজেরও কোনো আপত্তি ছিল না। একথা তো সত্যি তারা একদিন সেই ছেলেবেলায় লুকিয়ে বকুল তলায় গিয়ে ধুমসে চুমো খেয়েছিল একে অপরের মুখে। কিশোর শরীরের সাথে ল্যাপ্টালেপ্টি হয়েছিল কিছু সময়। একবার শখ করে উঠোনের নিশিগন্ধার ঝোঁপা ছিড়ে জড়িয়ে দিয়েছিল ঝুমুরের চুলে। বলেছিল, আজ সারারাত তোরে আমি ঘুমোতি দেবো না নে!
ক্যান? লাজুক হেসে বলেছিল ঝুমুর।
সারারাত এই নিশিগন্ধা আমার কথা তোরে ভুলতি দেবে না নে।
তার চিবুক নেড়ে দিয়ে বলেছিল মেজবাহ।
আর খিলখিল করে উঠে ঝুমুর বলেছিল, ইশ্ রে!
কিন্তু তবু তার ফুপার এক কঠিন মনোভাবের জন্যে বিয়েটা শেষমেশ হলো না।
কী কারণে মেজবাহ জানে না, ফুপা ছেলেবেলা থেকে মেজবাহকে দু'চোখে দেখতে পারত না। এখনও গ্রামেগঞ্জে হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে গেলে মেজবাহ সরিয়ে নেয় তার চোখ।
কেন জানি ফুপাকে সে মনে মনে ভয় পায়। মনে হয় ফুপা তাকে ঘৃণা করে। অথবা ফুপা কি কোনোদিন ঝুমুরকে নিয়ে তাকে সন্দেহ করেছিল। ঝোঁপে ঝাড়ে কোনোদিন তার ও ঝুমুরের গোপন মেলামেশার ওপর পড়েছিল তার চোখ? অথবা হয়ত এসব কিছু নয়। হয়ত দ্বন্দ্বটা ছিল তার বাবার সাথে, বাবা মরে গিয়ে দ্বন্দ্ব হলো মেজবাহর সাথে।
প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হয়েছিল মেজবাহর। ঝুমুরের কথা সে জানে না। কোনোদিন জানার চেষ্টাও করেনি। জানার কথা ভাবলেই কেমন এক ভয় তাকে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরত। বরং এই ভালো। এইসব না জানা। এইসব না বোঝা। বুঝলেই যত বিপত্তি। আর যে কোনো বিপত্তির সামনা হতে মেজবাহর ভয়।
তার এই দুর্বলতার কথা কি ঝুমুর জানে?
মেজবাহ সেটা জানে না।
ফুপার দুই ছেলে কাতারে চাকরি করে। দুই বউ তাদের থাকে নিজের নিজের বাপের বাড়ি। তারা কেউ ফুপার সংসারে আসে না। এর জন্যে ফুপুর মনে যে অশান্তি হবার, তা হয়। ফুপাও মনে হয় এ ব্যাপারে অসহায়। তবে সারা জীবন নিজে ঘরজামাই হয়ে থাকার জন্যে তার মনে হয়ত কিছু দুর্বলতা থাকতেও পারে। তার জন্যে হয়ত সে ছেলে বউদের শ্বশুর বাড়ি আসার জন্যে ঝুল ধরতে পারে না।
ফুপু তার ভাইয়ের ছেলের সাথে ঝুমুরের বিয়ে দিতে ঝুল পাড়লে ফুপা বলেছিল, মেজবাহর সাথে ঝুমুরের বিয়ে দিতি চাও কেন? কি নিজের মেয়ের কপাল পুড়োবার জন্যি, হ্যাঁ? মেজবাহ কি স্বাভাবিক নাকি? সাত চড়ে যার মুখি রা ফোটে না, সাতদিন যে জঙ্গলে পালায়ে ছিল মেলেটারির ভয়ে, যে মেলেটারি তার পরদিনই গেরাম ছেড়ে চলে গেছে, বুঝলিও বোঝে না, ঘুরে ঘুরে জঙ্গলে ঢুকে লুকোয় থাকে, রাত কাটায়, তার কাছে মেইয়ে দিতি চাও, ক্যান? মেয়ে কি তুমার বেশি হইয়ে গেছে?
তারপর বলেছিল, এখন দিনকাল ঠাণ্ডা, যুদ্ধ নেই, ঝামেলি নেই, তাও সে জঙ্গলে রাত কাটায়, বেদেগের পাছে পাছে জঙ্গলে ঘোরে, তাদের সঙ্গে বসে খায়, ঘুমোয়, গল্প করে, তুকতাক করে। তার কাছে মেইয়ে বিয়ে দিবার জন্যি ঝুল ধরো, পাগল কুথাকার!
তো বিয়ে আর হলো না। সেই থেকে ফুপুর বাড়ির সাথে তার মায়ের একটা বৈরিতার সৃষ্টি হয়ে গেল। সে বৈরিতা এখন হয়ত ততটা নেই, কিন্তু আগের মতো আর মাখামাখি থাকল না। মেসবাহ অবশ্য এসব বেশি আমল দেয় না। কারণ সে মোটেই এর জন্য দুঃখিত বা অনুতপ্ত নয়। সে কথা বলে কম। একথা ঠিক। কিন্তু যা তার করতে ইচ্ছে করে, সে তা করে। কারও কথা শোনো না। কারও কথা শোনার তার প্রয়োজনও নেই। আগে সে বেদেদের পেছন পেছন ঘুরত। তখন সে খেয়ালি ছিল। এখন আর ঘোরে না। এখন বেদেরাই তার পেছন পেছন ঘোরে। টাকা পয়সা চায়। মেজবাহর নিজের কোনো ভাইবোন নেই। সে একাই তার মায়ের সংসারের সবকিছু।
তাছাড়া যার সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছিল সেই ফুপাতো বোনের এখন চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে। চেহারা যতদূর বাজে দেখতে হয়। ছেলেবেলার সেই দুধে আলতায় রঙ এখন কোথায় হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেছে। শরীরের বাঁধনও আর সেই আগের মতো নেই। দূর থেকেই বোঝা যায় তার স্তন ঝুলে গেছে। শরীরের চামড়া শিথিল। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এ ব্যাপারে ঝুমুর মোটেই দুঃখিত বা লজ্জিত নয়! বরং সে বাপের বাড়ি এলেই ঝিমিয়ে থাকা বাড়ি সরগরম হয়ে ওঠে। উচ্চকণ্ঠে কথা বলে। সারাটা বাড়ি দাঁপিয়ে পাড়ার সবাইকে জানান দিয়ে বেড়ায় তার উপস্থিতি। ছেলেমেয়েগুলোকে একভাবে বকাঝকা করতে থাকে। বিষাক্ত সব বাক্যবাণ তার ঠোঁটের ডগায় সর্বদাই প্রস্তুত। সেই বাক্যবাণের ধারা যে সবটাই ছেলেমেয়েদের প্রতি ধাবিত তা মনে হয় না মেজবাহর। কথার আড়ালে যেমন কথা থাকে, এইসব বাক্যবাণের আড়ালেও থাকে অনেক ইঙ্গিত। সেটা যে বুঝতে পারে, সে পারে। যে বোঝেনা, সে বোঝেনা।
এইসব কারণে তার দিকে তাকাতে এখন আর ইচ্ছেই করে না মেজবাহর। আগে আগে যাও বা করত, একদিন ঝুমুরের মুখে খারাপ একটা গালি শুনে তার মন এতটাই খারাপ হয়ে গেল যে এখন ঝুমুর তার বাপের বাড়ি এলেও এবং মেজবাহর বাড়ির চটার ফাঁক দিয়ে ফুপুদের বাড়ির উঠোন চোখে দেখা গেলেও, পারতপক্ষে মেজবাহ আর সেদিকে তাকায় না।
সেই গালিটা ছিল, ভেড়ুয়া বিটা! অর্থাৎ কাপুরুষ মিনসে।
কিন্তু কাকে যে উল্লেখ করে তার ফুপাতো বোন ঝুমুরের এহেন আক্ষেপ বা কথার খোঁটা, মেসবাহ সেটা জানে না। আর জানে না বলেই কথাটা যে তার উদ্দেশে বলা এ ব্যাপারে সে একেবারে নিঃসন্দেহ।
কিন্তু মেসবাহ মনে মনে জানে সে ভেড়ুয়া নয়। সে সাহসী । অতিশয় সাহসী। যে সাহস তার গ্রামের চৌহদ্দির ভেতরে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। চৌহদ্দির বাইরেও যে গ্রাম , বিশাল বিস্তীর্ণ বাংলাদেশ, সেখানেও কি কেউ বা কোনো বা কোনো কোনো মানুষ বিশ্বাস করতে পারবে? মেজবাহ সেটা জানে না।
মেজবাহর মা ইদানিং মেজবাহর বিয়ে দেওয়া নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। ছেলের বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই, এর পরে কোনো কুমারি মেয়ে কি আর মেজবাহর বিয়ের জন্যে পাওয়া যাবে নে? না। তখন কি হবে? কোনো বিধবা বা আইবুড়ো মেয়ে, যার জীবনে কোনোদিন বাচ্চা হবে না, তার সঙ্গে তখন মেজবাহকে বিয়ে দিতে হবে। সে হবে মায়ের জন্যে হৃদয় বিদারক এক ঘটনা।
মা ওদিকে মাথা কুটে মরে , আর মেজবাহ রাত হলেই জঙ্গলের ভেতরে। ঘন্টা দু'ঘণ্টা সে জঙ্গলে গিয়ে সময় কাটায়। আর যখন সে সেখান থেকে ফিরে আসে, একদিন মেজবাহর মা রাত জেগে ছিল ছেলের বাড়ি ফিরে আসার অপেক্ষায়, দেখেছিল ছেলে তার ফিরে আসছে ঘর্মাক্ত অবস্থায়। তার কপাল বেয়ে, চিবুক বেয়ে ঝরে পড়ছে ঘাম।
দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল মা। কিন্তু হাজার প্রশ্ন করেও ছেলের কাছ থেকে সে সদুত্তর বের করতে পারেনি।
একদিন গ্রামের কেউ কেউ গোপনে মেজবাহর অজান্তে জঙ্গলে ঢুকে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি। তাদের শরীরের ভেতরে এমন এক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল আর এমন এক ভয় যে তারা কুয়ো পাখি কয়েকবার ডাকার পরেই রাতের নিঃশীমতা শরীরে ধারণ করে তুর তুর করে পালিয়েছিল সেখান থেকে। তারপর আর সেখানে যায়নি।
সেদিন থেকে আর কেউ মেজবাহর পাছও নেয়নি।
কিন্তু না নিলে কি হয়। তাদের মনে কৌতূহল দিন দিন বাড়তেই থাকে। মেজবাহর বোন কীভাবে যেন মনে হয় মেজবাহর জঙ্গলে ঢোকার কারণটা জানে। আকারে ইঙ্গিতে মেজবাহকে সে শুনিয়ে মাঝে মাঝে বলে, জানি গো জানি, অনেক মাইনসির গোপন কথা জানি! ধুলো খেইয়ে তো আর বড় হইনি। তো ওসবে কইরে কোনো লাভ নেই। সবই বিফলে যাবে!
পাশের বাড়ি থেকে বোনের এইসব কথা শুনলে মেজবাহর শরীর ভয়ে হিম হয়ে যায়।
সে কিছু বলে না। কিন্তু তার মন অস্থির হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে তার ভেতরে প্রচণ্ড রাগ আর ক্ষোভ হয়। মনে হয় বাঁশের জালি দেয়া বেড়া

ভেঙে সে ফুপাতো বোনের চুলের ঝুঁটি ধরে বলে , কি বলতি চাচ্ছিস, বলে ফ্যালাদিনি, দুষ্ট! তোর সাথে আমার বিয়ে হইনি, সেইডা কি আমার দোষ?

কিন্তু মনে মনে এতসব কথা বললেও তার সাহস হয় না বোনের সামনে কোনো কথা বলতে। সে নীরবে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। রাস্তায় হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে গঞ্জের চায়ের দোকানে গিয়ে বসে। গঞ্জটা খুব ছোট। সারাদিনে অল্প সল্প কিছু বেচাকেনা হয়। আর বড় গঞ্জ যেটা আছে সেটা এই গ্রাম থেকে মাইল দু'য়েক দূরে। সেখানেই মেজবাহ তার কাজকর্ম সারার জন্যে নিয়মিত ঢুঁ মারে। তার কাজ মূলত শস্য এবং পাট উৎপাদন এবং মহাজনের কাছে বিক্রি করা। তাছাড়াও নিজের জমির জন্যে সার কেনা, কামলা ঠিক করা, খেত নিড়ানো, উঠোনের দূরপ্রান্তে কয়েকটা আটচালা ঘরে ধান আর পাট কাটার মৌসুমে মুনিষদের দেখাশোনা করা যেন তারা কাজে ফাঁকি না দেয়, এগুলোও তাকে করতে হয়। ধান কাটা, ধান মাড়াই করা, বিলের পানিতে পাট পচানো, পাট ছাড়ানো, পাটের গুছি বাঁধা সব মুনিষরাই করে দিয়ে থাকে, এসবও তারই তদারকিতে সম্পন্ন হয়; তার পরও হাতে সময় থাকে গঞ্জের বটতলায় বসে আয়েসে কলাই করা মগে চা পান করার, লুঙ্গির কোচা পায়ের নাড়ায় দুলিয়ে কোনো কোনো ব্যাপারির সঙ্গে দেশের দুরবস্থার কথা আলোচনা করার, যদিও মনে মনে জানে এসব দুরবস্থা তার জন্যে যেন সুদূরের কোনো আখ্যান, যা তাকে কোনোদিন স্পর্শ করবে না। ঘরে তার বাটারি চালিত একটা দূরদর্শন আছে, কিন্তু সে দূর দূর থেকে আসা ব্যাপারিদের মুখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গল্প শুনতেই বেশি পছন্দ করে। সে নিজে কথা বলে কম। কিন্তু মন দিয়ে শোনে অন্যের মুখের লাগাম ছাড়া কথা। তার চেহারার ভেতরে এক ধরনের স্বপ্নময়তা আছে যেটা তাকে দৈনন্দিন কঠিন বাস্তবতার কাছ থেকে অনেকখানি দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম। তাছাড়া এক ধরনের অন্যমনস্কতাও তাকে বিদ্ধ করে মাঝে মাঝে। এই অন্যমনস্কতার সুযোগ অবশ্য কেউ কেউ নেয়। এতে অনেক সময় তার আর্থিক ক্ষতিও হয়েছে, কিন্তু কিছু তো করার নেই।

গ্রামের বটতলার নিচে চায়ের দোকান পেতে বসে প্রতিদিন সবুর আলি। চা পান আর সিগারেটের দোকান। বিড়িও পাওয়া যায়। বাপ দাদার রেখে যাওয়া জমি বিক্রি করে তার ভাই কুয়েতে কাজ করতে চলে গেছে। ভাইকে নিয়ে সবুর আলির ভারী গর্ব। সেখানে সে এক শেখের বাড়িতে চাকরি করে। তাদের শানশওকতের কথা মাঝে মাঝে মোবাইলে বলে সবুর আলি কাছে। ইদানিং সবুর আলি কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ বলে ওঠে , বোঝলেন মেজবাহ ভাই, আমারেও যাতি হবেনে কুয়েত। বড় ভাই এট্টুখানি থিতু হলিই আমারে নিয়ে যাবেনে সেখেনে।

তো সেখেনে গিয়ে তুমি কী করবা? কৌতূহলী হয়ে বলে ওঠে মেজবাহ। তার এ প্রশ্নে একটুও দ্বিধা না করে সবুর বলে, সেখেনে গিয়ে যা করতি বলে তাই করবোনে। আমার কোনো আপত্তি নেই।

আজ সেখানে পৌঁছে বিরস মুখে মেজবাহ বলল, আমারে এককাপ ভালোমতন চা কইরে দ্যাও দিনি, সবুর মিয়া।

সবুর মিয়া আজ খুব খুশি। নিশ্চয় ভালো কোনো খবর পেয়েছে বিদেশ থেকে। তবু সে মেজবাহর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আপনেরে আজ দেখতি কেমন যেন লাগতিছে মিয়াভাই। শরীলডা ভালো তো?

নীরবে মাথা নেড়ে মেজবাহ বলল , তুমি ভালো তো?

হ্যাঁ এ্যা এ্যা এ্যা-

বলে উঠল সবুর। তারপর খুশি গলায় বলল, বড় ভাই আমারেও কুয়েত পাঠাবে। দালালের সাথে কথাবার্তা বলতিছে। এবার আর জমি বিক্রি করবে না নে। জমি বন্দক দেবেনে মহাজনের কাছে।

মেজবাহ তার কথা শুনল নীরবে। একবার ভাবল সেও এরকম বিদেশ চলে যাবে নাকি? আজকাল তার আর ঘরে থাকতে মন লাগে না। তার ফুপাতো বোনের উৎপাত যেন দিনে দিনে বাড়ছে। ইদানিং প্রায় সে স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়িতে এসে পড়ে থাকে। তার আন্ডা গেন্ডা বাচ্চাকাচ্চাগুলো সারাদিন তাদের নানাবাড়ির উঠোনে হৈ চৈ করে। কানাঘুঁষো শুনেছে ঝুমুরের স্বামী নাকি তার ওপর অত্যাচার করে, মারধর করে। ঘন ঘন যৌতুক চায়। কিন্তু ঝুমুরের মুখে এসব কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। বরং উল্টো একটা গর্বে ঝুমুর মাঝে মাঝে এমন ভাবে হেসে ওঠে, এমন খিলখিল সে হাসি যে সেই হাসি কানে শুনলে মেজবাহর শরীর হিম হয়ে যায়। এত কীসের সুখ তার? স্বামী তার ফুপাত ভাই মেজবাহর চেয়ে বড়লোক বলে? তাহলে কেন ঘন ঘন যৌতুক চায়? নাকি মেজবাহর চেয়ে সে দেখতে সুন্দর? নাকি স্বামী তাকে শরীরের তৃপ্তি দিতে সর্বদাই তৎপর? কোনটা?

ঝুমুরের ছোট্ট ছেলেটি প্রায় মেজবাহর কাছে এসে তাকে মামা, মামা করে ডেকে গলা জড়িয়ে ধরে। আর সেটা কখনো টের পেলে ঝুমুর তীব্র স্বরে ছেলেকে কাছে ডেকে নেয়।

মুখ ঝামটা মেরে বলে, এত মামা, মামা কীসির জন্যি, হ্যাঁ? মামা তোরে কী করবেনে, হ্যাঁ? মামা কি তোরে খাওয়াবেনে না পরাবেনে? নাকি ভালোবাসবেনে, হ্যাঁ?

এ এক আশ্চর্য ব্যবহার ঝুমুরের। মেজবাহ এর কোনো তাল মাথা বুঝে পায় না। মনে মনে সে বিহ্বল হয়ে যায়।

কিন্তু ঝুমুর তাকে গালি দিলে কি হয়, রাত হলে মেজবাহ অস্থির হয়ে ওঠে। দিনের বেলা কতবার করে প্রতিজ্ঞা করে সে আর আজ জঙ্গলে প্রবেশ করবে না। কিন্তু রাত দু প্রহর হবার সাথে সাথে সে আর থাকতে পারে না। বন্ধ ঘরের ভেতরে খালি উঠবোস করে। কপালে জমে ওঠে বিজি বিজি ঘাম। দোনোমনো করতে থাকে মন। করতে করতে একসময় দরজা খুলে চুপি চুপি বেরিয়ে আসে। নীরবে বাঁশের বেড়ার জালি সরিয়ে সে হাঁটতে থাকে পায়ে চলার পথে। প্রথমে তার পায়ের গতি থাকে শ্লথ; যেন দ্বিধা জড়ানো, যেন ইচ্ছা অনিচ্ছার টানাপোড়েনে সে অস্থির। তারপর যত সময় যায়, তার পায়ের গতি হয়ে ওঠে দ্রুত। আরও দ্রুত। এভাবে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে সে পার হয়ে যায় ধানখেত, পাটখেত, বিল, খানাখন্দ আর বন্ধ্যা জমির সীমানা। প্রবেশ করে জঙ্গলে। এই জঙ্গল তার বাপ দাদার রেখে যাওয়া সম্পত্তি। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই জঙ্গল গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা দিয়েছিল বহুবার। হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যের দল যুদ্ধ চলাকালীন কোনোদিন এই জঙ্গলে ঢুকতে সাহস পায়নি। তারা কানাঘুঁষো শুনেছিল এই জঙ্গল হচ্ছে সাপদের আস্তানা। এখানে একবার ঢুকলে কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে না।

কিন্তু সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রামবাসীদের কাছে হানাদার বাহিনীর বেয়নেটের চেয়ে সাপেরা বেশি বন্ধু ছিল, তাই সেসময় গ্রামের মানুষ দফায় দফায় জঙ্গলে ঢুকে প্রাণ বাঁচাতে ইতস্ততঃ করেনি। অবশ্য তাদের সঙ্গে গ্রামের অনেক ওঝাও প্রাণ বাঁচাবার খাতিরে সেই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। সাপের ভয় ছিল তাদের কাছে নস্যি।

মিলিটারির ভয়ে ওঝাদের জঙ্গলে আশ্রয় নিতে দেখে গ্রামবাসীরাও বুকে সাহস পেয়েছিল।

আর আশ্চর্যের ঘটনা, সে সময় সাপের কামড়ে কেউ প্রাণও হারায়নি।

প্রতিবার গহীন রাতে জঙ্গলে ঢোকার সময় সেজবাহ ভালো করে চারপাশে তাকিয়ে দেখে। তার ভয় হয় কেউ বুঝি তাকে অনুসরণ করছে। তার বুক ঢিবঢিব করে কাঁপে। ছনমন করতে থাকে মন। একবার মনে হয় সে ছুটে চলে আসে সেখান থেকে। কিন্তু বুনো গাছপালার নিবিড় সাহচর্য যেন তাকে ফিরতে বাধা দেয়। তখন আস- শেওরা আর ধুন্দুল ঝোঁপ থেকে এমন একটা অচেনা গন্ধ বেরোতে থাকে যা তাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করে জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করতে।

অবশ্য একবার ভেতরে প্রবেশ করলে মেজবাহ অন্য মানুষ। তখন আর সে সেই পরিচিত মেজবাহ নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিত কেউ। সে তখন জঙ্গলের সরু পায়ে চলার পথ ধরে দৌড়াতে থাকে অবলীলায়। কাটা ঝোঁপ তার জামা- লুঙি আঁকড়ে ধরে, স্পঞ্জের স্যান্ডেল ভেদ করে কখনোবা তার পায়ে আঁকশি লতা জড়িয়ে যায়, কখনো চারপাশের রাতারাতি বেড়ে যাওয়া বুনো ঝোপঝাড় তাকে তাদের পাতা, ডালে, কাণ্ডে আচ্ছন্ন করে দেয়।

কখনো শিশ ওঠে দূরের কোনো মগডাল থেকে। মনে হয় অচেনা কোনো পাখির ডাক। আর মেজবাহ এই সবকিছুর সাথে সম্পক্ত হতে হতে, আত্তীকরণ হতে হতে দৌড়াতে থাকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। নির্দিষ্ট সীমানায়।

তারপর ঝুপ করে একটা জায়গায় এসে বসে পড়ে।

বসে পড়ে সে উপুড় হয়ে যায়।

উপুড় হতে হতে মিশে যায় সে মাটির সাথে। লম্বা হয়ে মিশে যায়। তখন তার শরীরের ঘ্রাণে বুনো লতাপাতার গন্ধ ম' ম' করতে থাকে। সেও তখন যেন এই অরণ্যেরই একজন।

কিন্তু এখানেই সবকিছুর শেষ নয়। সবকিছু শেষ হয় না।

এরপর আরও কিছু থাকে। সেই ভয়ঙ্কর আরও কিছু, যখন সে গর্তের ভেতরে তার লম্বা হাত ঢুকিয়ে দেয়। হাত ঘোরানোর মুন্সিয়ানায় সে তুলে আনে বিরাট এক কুন্ডলি পাকানো সাপ। এই সাপের শরীরে নানাবিধ চকরাবকরা দাগ। কোনোটা গোল। কোনো চৌকো। কোনোটা অর্ধবৃত্ত। কোনোটা বা কিছুই নয়, শুধু একটা দাগ। কিন্তু সব তখন কুন্ডলি পাকানো।

তারপর তার হাতের তালুর ওপর ভরতনাট্যম দেখিয়ে ধীরে ধীরে সাপটা কুন্ডলি খোলে। কুন্ডলি খুলতে খুলতে সে লম্বা হয়ে যায়। এমনই লম্বা যে সে মেজবাহর শরীরটাকে পাক দিয়ে ধীরে ধীরে জড়িয়ে ফেলে। ধীরে ধীরে পাক দেয় আর ধীরে ধীরে জড়িয়ে ফেলে। ভেজা, শীতল, পিচ্ছিল, বড় নিবিড় সেই বন্ধন। তারপর মেজবাহর গলার কাছে এসে সে ক্ষ্যান্ত দেয়। তার মুখের ওপর তার নিজের সরু মুখটা নিয়ে এসে রাখে। তার গালের সাথে নিজের গাল। তারপর তার শরীরে স্পন্দন শুরু হয়। সে ক্রমাগত সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত হতে থাকে। মেজবাহর আলতো হা করা মুখের ভেতর নিজের মাথাটা অনায়াসে ঢুকিয়ে দেয়। আবার বের করে। আবার ঢুকিয়ে দেয়। আবার বের করে। মেজবাহর সাথে এটা যেন তার খেলা। এই খেলা দেখে মাঝে মাঝে মুখ সরিয়ে মেজবাহ হেসে ওঠে। তারপর আদর করে সেই সরিসৃপের শরীরে সে বেদম চুমো খায়। চুমো খেতে খেতে নিজেই সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তার শরীরে ঘাম দেখা দেয়। সে কাঁপতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে সে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে। তারপর নিজেকে যেন ছেড়ে দেয়। তখন তার সর্বশরীরে পাক দিয়ে ফিরতে থাকে গহীন অরণ্যের সেই সাপিনি।

মেজবাহর মা একদিন তার ছানি পড়া চোখে ছেলের কাছে এসে হামলে পড়ল। তারপর বিলাপ শুরু করে দিল। প্রাণভেদী এই বিলাপে বাড়ির চৌহদ্দি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। উঠোনে চারটে শালিক ধান খুটে খুটে সমস্ত উঠোন চষে বেড়াচ্ছিল, তারা মুহূর্তে আকাশে পাক দিয়ে দূরে চলে গেল। গোয়ালের গাভিন গরুটা হাঁক দিয়ে উঠল হঠাৎ। তারপর ছর ছর করে পেশাব করতে শুরু করল। বাড়ির পাশেই বিলে হাঁস দিনটে প্যাঁক প্যাঁক করে উঠল। তারা মেজবাহর মা শরিফুন্নেসার গলার স্বর চেনে।

মায়ের ভাষ্য অনুযায়ী তার আর এ দুনিয়ায় বেশিদিনের স্থায়িত্ব নেই। মেজবাহকে সে দুনিয়ার বুকে সুস্থির দেখে যেতে চায়। সন্তানের জনক দেখে যেতে চায়। নইলে এই এতসব জমিজমা, ঘরবাড়ি, ধানখেত, পূর্বপুরুষ এসবের গতি কী হবে? সব কি বারো ভূতে এসে খাবে?

বারো ভূতে এসে সমস্ত সয় সম্পত্তি খেয়ে যাবার ভয় মেজবাহর মায়ের মনে চিরচারিত এক শঙ্কা। এতদিন মায়ের এইসব বিলাপ মেজবাহ কানে তোলেনি। কিন্তু সেদিন তার কি হলো, মায়ের বলিপড়া মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল তার মা সত্যি কথা বলছে। সত্যি, এ দুনিয়া ছেড়ে তার মায়ের পরপারে যাওয়ার সময় এসেছে। এই অমোঘ ডাক ফিরিয়ে দেবে সে ক্ষমতা মেজবাহের নেই। তার অনেক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা এবং সাহস থাকলেও এই ক্ষমতা তার নেই।

মায়ের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে এই এত বছর পরে সেদিন আর মেজবাহ না বলতে পারল না। তার মনে হল তাকে এভাবে দুনিয়ায় ছেড়ে গেলে মরেও তার মা কোনোদিন শান্তি পাবে না। মা ছাড়া এই দুনিয়ায় মেজবাহর আর আছে কে? তার তো আর কোনো ভাইবোন নেই।

মাঝে একবার সে অবশ্য ভেবেছিল যদি তার বিয়ে না হয়, তাহলে মরে যাবার আগে ফুপাতো বোন ঝুমুরের নামে সয়সম্পত্তি সব লিখে দিয়ে যাবে। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক মনে হলেও, বিশেষ করে তার প্রতি ঝুমুরের ব্যবহার চিন্তা করলে, ভাবনাটা তবু তার মনে আসে। যখন কেউ আশে পাশে থাকে না, তখন নীরবে নিভৃতে চিন্তাটা আসে। আবার রাতের চিন্তা দিনের আলোয় অলীক ভাবনার হাত ধরে ফুস করে উড়ে চলে যায়। মেয়েটিকে একদিন সে চোখেও দেখে আসে। মেয়েটি পিতৃমাতৃ হারা। লঞ্চ ডুবিতে তারা বহুদিন আগে মারা গেছে একসাথে। নদীতে লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি। মেজবাহ তাকিয়ে দেখে নিরীহ শান্ত চেহারার একটি ষোল সতেরো বছরের মেয়ে। ভাগ্য তাকে শিশু বয়সেই অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে। মেয়েটিকে দেখে মেজবাহর মনে কোনো ঢেউ ওঠে না, শুধু করুণা এবং বাৎসল্য রস ছাড়া। সেদিন তার খাতিরে তালুকদার বাড়িতে খাসি জবাই করা হয়।

সবচেয়ে খুশি হয় মেজবাহর মা। সে মেয়ে দেখার পরদিন থেকেই বাড়ি গোছগাছ করতে শুরু করে। মেজবাহর ঘরের ছাদের টিন পাল্টে নতুন

> মেজবাহ কি স্বাভাবিক নাকি? সাত চড়ে যার মুখি রা ফোটে না, সাতদিন যে জঙ্গলে পালায়ে ছিল মেলেটারির ভয়ে, যে মেলেটারি তার পরদিনই গেরাম ছেড়ে চলে গেছে, বুঝলিও বোঝে না, ঘুরে ঘুরে জঙ্গলে ঢুকে লুকোয় থাকে, রাত কাটায়, তার কাছে মেইয়ে দিতি চাও, ক্যান? মেয়ে কি তুমার বেশি হইয়ে গেছে? তারপর বলেছিল, এখন দিনকাল ঠাণ্ডা, যুদ্ধ নেই, ঝামেলি নেই, তাও সে জঙ্গলে রাত কাটায়, বেদেগের পাছে পাছে জঙ্গলে ঘোরে, তাদের সঙ্গে বসে খায়, ঘুমোয়, গল্প করে, তুকতাক করে। তার কাছে মেইয়ে বিয়ে দিবার জন্যি ঝুল ধরো, পাগল কুথাকার!

ঢেউ টিন বসাবার তোড়জোড় শুরু করে। পাকা দালানের গায়ে চুনকাম করার জন্যে গ্রামের রঙমিস্ত্রিকে খবর দেয়। বাতাসে কোত্থেকে একটা আনন্দের সুর এসে যায়। পাড়ার মানুষেরা প্রথমে কানাঘুঁষো করলেও পরে একজন দুজন করে আনাগোনা শুরু করে মেহবাহর বাড়ি। বয়স বেশি হলেও বা কি। এটাই তো মেজবাহর জীবনে প্রথম বিয়ে হয়, নাকি? কিছুদিন বাদে গায়ে হলুদ হয়ে যায় বর কনের। গ্রামের প্রথা অনুযায়ী রাত জাগা হয়, গান বাজনা হয়, চটুলতা হয়। তালুকদার সাহেবের বাড়িতে একদিন জারিগানও হয়। কনের বাড়ি গ্রামের অন্যপ্রান্তে হলেও প্রতিদিন কোথায় কি হচ্ছে সব খবর এদিক থেকে ওদিকে চালাচালি হয়।

সময়টা ফাল্গুনের মাঝামাঝি। আবহাওয়া মনোরম। মেজবাহর মা তার পাড়ার মেয়েদের সাহায্যে সবকিছু সুচারু ভাবে গুছিয়ে ফেলে।

আগামীকাল বিয়ে। গ্রামের মাতবর গুলজার হাজি মেজবাহর মুরুব্বি হয়ে তালুকদার বাড়ি যাবে। গ্রামের মসজিদের নজিবর রহমান হুজুরকে আগেই বলে রাখা হয়েছে। সেই সাধারণত এ গ্রামের বিয়ে বা তালাক পড়িয়ে থাকে বেশির ভাগ সময়। বিয়ে করবো না, মুখে বললেও মেজবাহর মনের ভেতরে কোথায় যেন পুলক লাগে। এতদিন যখন বিয়ে করেনি, ভালোই ছিল, কিন্তু এখন বিয়ের রব উঠে যাবার পরে ভেতরের অবদমিত অনেক কিছু যেন একসাথে বেরিয়ে আসতে চায়। রুদ্ধদ্বার খুলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে চায় অনেক কিছু। বিস্তারিত হতে চায়। আর তাছাড়া সত্যি বলতে সে বিয়েই বা করেনি কেন এতদিন? তারও কোনো পরিষ্কার ব্যাখ্যা তার কাছে নেই। যা আছে তা হলো কুয়াসায় জড়ানো এক জাল। যার ফাঁকফোকর দিয়ে কোথাও আলোর আভাস, কোথাও অন্ধকারের সরু তেকোণা ছোপ। কোথাও এমন কিছু জরিবুটি যার ভেতরে ঢোকা স্বয়ং মেজবাহরও সাধ্য নেই।

ঝুমুরের মুখে এসব কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। বরং উল্টো একটা গর্বে ঝুমুর মাঝে মাঝে এমন ভাবে হেসে ওঠে, এমন খিলখিল সে হাসি যে সেই হাসি কানে শুনলে মেজবাহর শরীর হিম হয়ে যায়। এত কীসের সুখ তার? স্বামী তার ফুপাত ভাই মেজবাহর চেয়ে বড়লোক বলে? তাহলে কেন ঘন ঘন যৌতুক চায়? নাকি মেজবাহর চেয়ে সে দেখতে সুন্দর? নাকি স্বামী তাকে শরীরের তৃপ্তি দিতে সর্বদাই তৎপর? কোনটা? মেজবাহ বিরস মনে মাঝে মাঝে ভাবে। ঝুমুরের ছোট্ট ছেলেটি প্রায় মেজবাহর কাছে এসে তাকে মামা, মামা করে ডেকে গলা জড়িয়ে ধরে। আর সেটা কখনো টের পেলে ঝুমুর তীব্র স্বরে ছেলেকে কাছে ডেকে নেয়

এই সময় আবার শুক্লপক্ষ চলছে। আকাশের মাঝখানে ঝুলে থাকছে চাঁদ। বাতাসে ভেসে আসছে বুনো ফুলের গন্ধ, যে গন্ধ শরীরে উন্মাদনার সৃষ্টি করে। অনেক আগে উঠোনের পশ্চিম দিকে নিশিগন্ধার ঝোপ ছিল, তখন রাতের বেলা গন্ধে ভুরভুর করত বাতাস। একদিন, সেই বহুদিন আগে, নিশিগন্ধার একটি ছড়া সে গুঁজে দিয়েছিল ঝুমুরের চুলে। ঝুমুরের রক্তলাল মুখখানা তার এখনও স্মৃতির ভেতরে যেন ঘাপটি মেরে আছে!

মেজবাহর ঘরবাড়ি সুন্দর করে ঘষামাজা হয়েছে। বাড়ির পুরাতন বেড়া পাল্টে নতুন বেড়া বসানো হয়েছে। বাড়ির উঠোনে আল্পনা এঁকেছে পাড়ার বিবাহিত মেয়েরা।

আজ গায়ে হলুদ দেবার সময় পাড়ার ভাবিদের সঙ্গে ঠাট্টামস্করা হয়েছে অনেক। জীবনের এক ক্রান্তি লগ্নে সকলের এরকম শুভার্থী চেহারা মেজবাহকে আপ্লুত করেছে মনে মনে। এমনকি যে মেয়েটিকে সে মাত্র একবার চোখে দেখেছে তাকে নিয়েও নানারকমের কল্পনায় ভরে উঠছে তার মন।

মেজবাহ গ্রামের ছেলে। গ্রামেই তার বড় হয়ে ওঠা। বাইরে কোনোদিন সে বসবাসের জন্যে যায়নি, তার যাবার প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু তার মনের ভেতরে এক ধরনের সচেতনতা আছে। আর সেটা হলো এক ধরনের সূচিবাইগ্রস্ত পাপ পুণ্য বোধ। যদি না তার মা বেঁচে থাকত হয়ত সে জীবনেও বিয়ে করতে ইচ্ছে করত না।

রাতের বেলা সকলে যখন ঝিমিয়ে পড়েছে মেজবাহ তার ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল চাঁদ। ভাঁট ফুলের গন্ধে চারপাশে কেমন একটা মদির ভাব হয়েছে। উঠোনের চারপাশ ঘিরে লাগানো গাছগুলোর ছায়া পড়েছে উঠোনজুড়ে। তার ফাঁকে ফাঁকে কোথাও চাঁদের আলো, কোথাও শুধুই পাতলা ছায়া। আগামী কাল এই সময় এই বিছানায় আরও একজন তার সঙ্গে থাকবে। অচেনা আবার খুব চেনা একজন। যে হবে তার জীবন সাথি। কথাটা ভাবতে মেজবাহর শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সে অনেক কিছু ভাবতে লাগল, যা এর আগে কোনোদিন ভাবেনি।

ফুপাতো বোনের কথা একবারও যে মনে হলো না সেটাও সত্যি নয়। মেজবাহর বিয়ে হবে শুনে সেই বোন তার স্বামীর সংসারে আবার ফিরে গেছে। অত্যাচারী স্বামী হলেও এ মুহূর্তে মেজবাহর চেয়ে যে সে ভালো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ঝুমুরের সেই খিল খিল হাসির অর্থ কি মেজবাহ বোঝেনি?

যে সংসারে প্রেম নেই সেখানে থাকতে ঝুমুরের কী ই বা অসুবিধে!

ফুপাতো বোনের মনের কথা সঠিক না জানলেও তার কথা ভাবতে ভাবতেই একসময় ঘুমিয়ে গেল মেজবাহ।

গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে গেল মেজবাহ। তার মনে হল সে আর একাকি নয়। বিচ্ছিন্ন নয়। অদ্ভুত এক অনুভূতি আচ্ছন্ন করল তার মন। সেই সাথে শরীরও। তার শরীরে সে এক পেষণের অনুভূতি পেল। গতকাল রাতে সে জঙ্গলে যাবার জন্যে সময় করে উঠতে পারেনি। কিন্তু এখন অনুভবে বুঝতে পারল কাজটা সে ঠিক করেনি। এত বছর, সেই স্বাধীনতার বছর থেকে আজ এই এতদিন পর্যন্ত, এমন একটা দিন ছিল না যেদিন মেজবাহ জঙ্গলে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সময় কাটায়নি। মানুষ যেমন নেশাগ্রস্ত হয়, তাস পাশা খেলে, তেমনি ছিল মেজবাহর জীবন। ঘুমোতে যাবার আগে অন্তত সে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও অরণ্য বিহার করবে। সাপিনি তাকে জড়িয়ে ধরে তার গালের ওপরে গাল রেখে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। যেন সে ক্ষুব্ধ। যেন সে বঞ্চিত। যেন সে দুঃখিত। প্রতি মুহূর্তে জাড়িয়ে, পেঁচিয়ে, আঁকাবাঁকা হয়ে মেসবাহর শরীর সে পাক দিয়ে ফিরতে লাগল। প্রতি বেষ্টনে সে প্রকাশ করতে লাগল তার বিরহ। তার ক্ষোভ। অবিশ্রাম এই পাক দেয়া। অবিশ্রাম এই ফোঁস ফোঁস।

রাগ করিছিস? অ্যাই ঝুমুর, তুই রাগ করিছিস? আজ রাত্তিরি আমি যাতি পারিনি, তাই আমার উপর রাগ করিছিস, পাগলি? কথা বলতে বলতে সেই রাগান্বিত, অভিমানিত, ক্ষুব্ধ, ফুলে ওঠা শরীরে সে হাত বুলোতে লাগল। এরপর মেজবাহর মুখের গহ্বরে সাপিনি ঠেলে ঢুকিয়ে দিল তার মুখ। আবার বের করল। মেজবাহর মুখের লালা টেনে এনে ভরিয়ে দিল মেজবাহর গাল আর ঠোঁট। আর মেজবাহ ক্রমাগত তার শরীরে বুলোতে লাগল হাত। যেন তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। সেই কোন যুগে এক মোড়ল বেদের কাছ থেকে সে আয়ত্ব করেছিল সাপ বশীভূত করার বীজমন্ত্র, সেই মন্ত্র দিয়ে সে বশীভূত করেছিল একের পর এক সাপ। একসময় একটি সাপও বশীভূত করেছিল তাকে। যে সাপ এই চন্দ্রবোড়া। পিচ্ছিল নরম ঘর্মাক্ত এই সরীসৃপ মেজবাহর শরীরে লতিয়ে উঠতে লাগল এখন বারবার। তার ফনা নেই বটে, কিন্তু তার আবেগ আছে প্রচণ্ড। মেজবাহর গলা পেঁচিয়ে, বুক পেঁচিয়ে, মাজা পেঁচিয়ে সে ক্রমাগত ওঠানামা করতে লাগল। চোখের পলকে একবার সে মেজবাহর মাথা জড়িয়ে, তারপর তার চিতানো বুকে, পর মুহূর্তে সে তার পেটের ভেতরে কুন্ডলি পাকানো অবস্থায়; এই মুহূর্তে সে গোটানো, পর মুহূর্তে সে লম্বিত। আবার লম্বিত হতে হতে সে তার মেজবাহর বলিষ্ঠ জঙ্ঘা, হাঁটু, পা, পায়ের পাতায় ক্রমাগত পিচ্ছিল, ক্রমাগত অপসৃয়মান নকশা কেটে যেতে লাগল। আর্দ্রতায়, নিঃশব্দতায়, নির্জনতায় আরামে চোখ বুজে এল মেজবাহর। যেন এও এক ভালোবাসা। যেন এও এক সঙ্গম! আঃ। বলে উঠল মেজবাহ।

এরপর যা হলো তা পৃথিবীর বুকে হরহামেশাই ঘটে থাকে। বাতাস তখন স্তব্ধ হয়ে যায়। ঘূর্ণিত, চূর্ণিত বাতাস কুন্ডুলি পাকিয়ে পড়ে থাকে। পৃথিবী তখন ঘুমায়ে থাকে। মানুষেরা স্বপ্নে থাকে বিভোর।

মেজবাহ এই সময় আ, আ, আ, আ, করতে থাকে। এই শব্দ খুব চাপা এক গোঙানির মতো। কিছুটা ক্রন্দন, কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা বা অন্য কিছু, তা বোঝার মতো অবস্থা মেজবাহর তখন থাকে না।

থাকার কথাও নয়।

পরদিন মেজবাহর ঘরের দরজা ভেঙে ফেলে গ্রামের মানুষেরা ঘরে ঢুকল। নতুন ঢেউটিন বসানো মেজবাহর নিজস্ব ঘর। উদ্ধার করার মতো বেশি কিছু ছিল না। শুধু মৃত ও ঠান্ডা একটা দেহ। আর তার সাথে গলায় ভীষণ আড়ষ্ট ভাবে পেঁচিয়ে থাকা একজন ঝুমুর।